Available online at http://www.ijims.com

ISSN: 2348 – 0343

Variegated Exertion in Bengali Drama : Dramatist Manmatha Roy

বাংলা নাটকে বিচিত্র প্রয়াসঃ নাট্যকার মন্মথ রায়

Abhijit Gangopadhyay

Nahata J.N.M.S Mahavidyalaya ,W.B. , India

Abstract

Renowned critic Narayan Choudhury called Manmatha Roy as a perfect successor of Dinabandhu Mitra. It's true that after Rabindranath Tagore, the anti-imperialist tradition in drama was bear by Manmatha Roy alone and the consummation of his social judgment in this regard was really taken for an instant. Dramatist Utpal Dutta has also mentioned that Roy was able to reach from classic to modernity in Bengali Drama from the judgment of our hearts. In the real sense, Manmatha Roy himself was an era in Modern Bengali Drama. For nearly eighty years, he wrote and worked. He was the creator of Bengali one act play also. In 'Karagar' and 'Mahabharati' he was hard enough to hit the British ruler against their inhumane rule. In 'Mirkasim', 'Ashok', 'Chand Saudagar' and many other plays he has showed the same attitude of patriotism towards country. Following the intensity of his dramatic movement, when he was on a hunger strike in Presidency jail, Rabindranath redeem him and said ' Give up hunger strike, our literature claims you.' In this paper I have expressed myself for a judgement from the tradition to modernity of various playwrights as well as Manmatha Roy and tried to promote the episode, which is nearly compatible with modern trend in Bengali Drama of today and that is one of our most important legacy and excellence.

Key words: Manmatha Roy, Anti-Imperialist Tradition, One Act play, Dramatic Movement , Bengal Opera.

Article

আধুনিক নাটকের অভিধায় প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী তাঁকে অভিহিত করেছেন-'দীনবন্ধু মিত্রের সার্থক উওর সাধক' বলে। উৎপল দত্ত ও স্বয়ং একসময় বলেছিলেন, "বাংলা নাট্যশালাকে হাত ধরে ধ্রুপদী থেকে আধুনিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মন্মথ রায়।" (জুন, ১৯৮৫) সমালোচকের কথা অনুসরণে বলা যায়, বস্তুতই দীনবন্ধুর পরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যকে যদি কোনো নাট্যকার একক ভাবে অথচ সর্বাধিক সার্থকতার সঙ্গে কেউ বহন করে থাকেন তো তিনি মন্মথ রায়। আসলে মন্মথ রায় নিজেই হলেন একটি যুগ। প্রায় একাত্তর

বছর ধরে নাটক লিখেছেন তিনি। বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে এক আধুনিক নাট্যকার তিনি। সমকালীন সময়ের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের আধারে। আধুনিক নাটকের দিকচিহ্ন একাঙ্কের স্রষ্টাও তিনি। 'কারাগার'(১৯৩০) ও 'মহাভারতী'(১৯৫২) নাটকের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন। 'মীরকাশিম', 'অশোক', 'দিগ্বিজয়ী', 'চাঁদ সওদাগর', 'সাবিত্রী', 'পথে-বিপথে', 'জীবন-মরণ', 'জীবনটাই নাটক' ইত্যাদিও সেই সুরে বেজে উঠেছে। যে সাম্রাজ্যবাদ ও যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' অথবা 'মুক্তধারা' নাটকে, তাকেই যেন এক অন্য অথচ অনন্য প্রতিবাদী ভাবনার সুরে ফিরিয়ে আনলেন তিনি। আলুই-এর 'আন্তিগোনে' অথবা ক্লাউস মাত্রের 'মেফিস্টো' আমাদের উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু প্রতিবাদী নাটক 'কারাগার' শুধুই কি ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের কলোনিয়াল হ্যাংওভার অথবা নাট্যকারের প্রচার ধর্মীতা ? আমরা তো জানি বার্তা প্রচার এবং বার্তা জ্ঞাপনে কত তফাৎ। তাই তো জ্ঞাপনের অর্থে অথবা প্রতিবাদের মাত্রায় 'কারাগার' গোটা বিশ্বের। আবার কল্লোলের আধুনিকতা অথবা আধুনিকতার কল্লোল নিয়ে তো আমরা কত কথাই না বলি। কিন্তু যখন দেখি স্বয়ং মন্মথ কল্লোল নাটকের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা নিয়ে করেন প্রতিবাদ অথবা রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালা করার দাবীতে করেন পদত্যাগ অথবা উৎপল দত্তের মুক্তির দাবী নিয়ে করেন আন্দোলন তখন তাঁর বাস্তব জীবনভঙ্গির সাথে তাঁর লেখা নাটককে মিলিয়ে নিতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয়না। দুটোই তো জীবন যা কিনা খাঁটি এবং পরম্পরা। 'বঙ্গে মুসলমান' থেকে শুরু করে 'এদেশে লেনিন' পর্যন্ত তাঁর নাট্যরচনাধারায় এসেছে নানাতর রূপান্তর। 'কারাগার' নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন। এর পেছনে ধর্মবিশ্বাস, হিন্দু ঐতিহ্য, বাঙালী আবেগ, মিথ্ যাই থাকুক না কেন, বলার বিষয়টিতো বড়ই সমসাময়িক, আধুনিক। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন, পিপলস্ থিয়েটার সব কিছুর ঊর্ধে সেখানে একটা কথাই তো শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায় যা হলো প্রতিবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যে প্রতিবাদ জানাতে তিনি অনশন করেন আর সেই অনশন ভাঙাতে প্রেসিডেন্সী জেলের কারাগারে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে টেলিগ্রাম করে লেখেন "Give up hunger strike, our literature claims you" তখন সাহিত্যিক প্রতিবাদের এক অভিমুখ যেন তৈরী হয়ে যায় যার পরম্পরাকে নির্মাণ করেন একালের নাট্যকার মন্মথ রায় আর তার উত্তরাধিকারের তুণির তাঁর হাতে তুলে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যিনি একাল-সেকাল সব কালের।

কল্লোলের সাহিত্য অনুরাগী মন্মথ রায় প্রচলিত সামাজিক কু-নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তৎকালীন সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ জীবনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন। কল্লোলের আদর্শ স্পর্শ করেছিল তাঁর সত্তাকে। কল্লোলের মুখ্য চেতনা যে যৌবন চেতনা তাও যেন উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে। একসময় তিনি বলতেন: "শৈশব যায় বার্ধক্য আসে, কিন্তু যৌবন সব সময়ে থাকে। এই যৌবন হচ্ছে জীবনের স্পন্দন, এ যৌবন হচ্ছে কল্পনা শক্তি, এ যৌবন হচ্ছে সৃজন শক্তি।" তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু যতই তথ্যনিষ্ঠ হোক না কেন চরিত্র চিত্রণে এবং ভাবাদর্শ নির্মাণে তিনি ছিলেন খাঁটি প্রগতিপন্থী, নব জাগরণের সার্থক উত্তরসূরী, বিদ্রোহাত্মক ও মানবতাবাদী। পুরাণ-ইতিহাস নির্ভর স্বাধীনতা তাঁর নাট্যকর্মে এমন এক ঔদার্যের জন্ম দিয়েছে যার ফলে তিনি তৎকালের উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত অনেক চরিত্রকেই মনুষ্যত্বের নতুন মানদন্ডে বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যার ফলে পরবর্তী কালে অন্যদের লেখা অনেক পৌরাণিক- ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁরই নাট্যগুণ অনুসৃত হয়েছে।

১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ হলো তাঁর নাট্যরচনার প্রথম পর্ব। এ পর্বে রচিত নাটকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটক ৮টি আর একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। এই পর্বে রচিত 'মুক্তির ডাক' নাটকটি স্বল্পায়তন একটি একাঙ্ক নাটক যা তাঁকে একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তকের খ্যাতি এনে দেয়। 'মুক্তির ডাক' নামে ১৭ বছর বয়সে লেখা একটি ছোট নাটক দিয়ে যাঁর নাট্যরচনার শুরু তাঁর দ্রোহী জীবনের জাদুস্পর্শে গিরিশচন্দ্রীয় পুনরুত্থানবাদী পৌরাণিকতা থেকে নবীন যুগের রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী বৈপ্লবিক সৃজনের দিকে নাটক তার দিকচিহ্ন পরিবর্তন করলো। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে অনুভব করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মতা, সংলাপের ওজস্বিতা আর মানবিক আবেদনে ভরপুর চরিত্র সমষ্টি। আর এই সময়ে পূর্ণাঙ্গ যে ৮টি নাটক লেখেন তার মধ্যে ৫টির বিষয়ই ছিল ভারতীয় পুরাণ। সবুজপত্রের সম্পাদক ও প্রখ্যাত সমালোচক তাঁর লেখা একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' প্রসঙ্গে বলেন: "আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ও

জিনিস একান্ত দুর্লভ। নাটককে আমরা দৃশ্যকাব্য বলি। কিন্তু যা যথার্থ নাটক তা শুধু দেখবার বস্তু নয়, পড়বারও জিনিস। সত্য কথা বলতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ নাটক আমরা পড়বার বই হিসাবেই জানি, অ্যাকটিং পিস হিসেবে জানিনে। আমরা চোখে না দেখলেও মানস-চক্ষে সে সব নাটকের অভিনয় দেখতে পাই। 'মুক্তির ডাক' নাটকও আমি মানসচক্ষে দেখেছি এবং তাই দেখেই বলছি যে 'মুক্তির ডাক' একখানা যথার্থ ড্রামা।" ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সময়কালে মন্বন্তর, অর্থনৈতিক মন্দা, কালোবাজারি, ফ্যাসিবাদ, মূল্যবৃদ্ধি বিভিন্ন সময় মাথা চাড়া দিয়েছিল।এ সময়ে লেখা মন্মথ রায়ের নাটক গুলির মধ্যে বিশেষতঃ একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে এই বিষয়গুলি ছাড়াও দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রভৃতি ঘটনা অল্পবিস্তর ছুঁয়ে গেছে। বিবিধ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার লক্ষ্য করেছেন সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যেও এক আশার আলো যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্ন থেকেই দেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংগ্রামী ঐক্যভিত্তিক জীবনে এক জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফল রূপে আবির্ভূত হয়েছে অথবা আবিষ্কৃত হচ্ছে। সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ সৃষ্ট সেই আন্দোলনের আঘাতে দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ অথবা প্রগতিশীল লেখক সংঘের সাম্যবাদী মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিকতার স্বপ্নে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যা নাট্যকারেরও একান্ত কাঙ্খিত। বিশ্বযুদ্ধ ও পূর্বভারতে জাপানী আক্রমণের সময়কালীন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকাররা। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে তুলেছিলেন ইউথ কালচারাল ইন্সটিটিউট। ১৯৪৩ সালের পর ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগটি গণনাট্য সংঘ হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে আসে গ্রুপ থিয়েটার। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে এ সময় বা তার অব্যবহিত কিছু কাল পরে লেখা মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকগুলিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনের নিদারুণ দুর্দশার ছবি থাকলেও এই অর্থনৈতিক বন্ধন ও শোষণের মূল কারণ ছিল অনুল্লেখিত। কখনো কখনো শ্রমজীবী মানুষেরা তাঁর একাঙ্কে স্থান পেলেও কোথাও তাদের উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায় নি। এ বিষয়ে গবেষক জয়তী ঘোষ বলেনঃ "মনে হয় তখনও পর্যন্ত মন্মথ একজন উদারবাদী লেখক হিসাবে গোটা সমাজের চেহারাটাকে যেমন দেখেছেন তেমনই তুলে ধরেছেন। সর্বহারা মানুষের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে বিচার করেন নি। তাঁর একাঙ্ক আগাগোড়া জাতীয় ভাবধারায় সিক্ত।.....তাঁর নাটকে জাতীয়তা থাকলেও আন্তর্জাতিকতা ছিল না।" এই সমালোচনার উত্তরে রাখা যেতে পারে নাট্যকারের নিজস্ব উক্তি অথবা যুক্তিকেই। তিনি বলেনঃ ".....প্রকৃত মূল্যায়নের কর্তা মহাকাল। এমন দিন হয়তো এসে গেছে অথবা এসে যাবে সেদিন কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে আমার এই পঞ্চাশ বৎসরের ফসল মূল্যহীন প্রমানিত হবে। কিন্তু তাতে আনন্দও আছে এই জন্য যে, আমি যা দিয়েছি তার মূল্যের চেয়ে, যেটা আসছে বা এসেছে তার মূল্য কালের কষ্টিপাথরে অনেক বেশী। আর সান্ত্বনাও থাকবে এই জন্য যে, একে একে যে সোপান শ্রেণী আমরা রচনা করে দিয়েছি সেই সোপানই উত্তীর্ণ হয়ে তবেই হবে সেই মহা উত্তরণ। এবং আমি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করি আমার সোপান অতিক্রম করে আমাদের নাট্যসাহিত্য সেই মহা উত্তরণের পথে এগিয়ে যাক। বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের আসরে এক মহান আসন অর্জন করুক।" (বাংলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি, মন্মথ রায়, ২০শে নভেম্বর, ১৯৭২) এ যেন নাট্যকারের অকপট ও উদার নাট্যস্বীকৃতি। পঞ্চাশের দশকের পর থেকে মন্মথ রায় লিখেছেন ধর্মঘট, সাঁওতাল বিদ্রোহ, অমৃত অতীত, তারাস, শেভচেস্কো, শরৎ বিপ্লব, অমর প্রেম, লালন ফকির- এর মতো বেশ কিছু নাটক। এ কালে কিছুটা হলেও বদলেছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা। একদা মুক্তিসংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নাট্যকার তখন সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। '৬১ সালে লিখলেন, "রাজনীতি থেকে আমাদের নাটক বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আমাদের এখনকার নাট্যধারা প্রবাহিত হোক সমাজতান্ত্রিক খাতে। বিশুদ্ধ নির্ভেজাল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে গড়ে উঠুক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আমি মরতে চাই। আগে মরলে সেটা হবে আমার অপমৃত্যু।" ব্রিটিশের রাজরোষে যাঁর 'কারাগার' নিষিদ্ধ হতে হতে আবিষ্কার করেছিল পালাবদলের নাটকের অপরিমেয় শক্তিকে তিনিই আবার ষাটের দশকে নাটককে দেখলেন সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে। শিল্পের তাৎক্ষণিক উপযোগিতাতে তখন তাঁর বিশ্বাসবোধ ঘনীভূত হচ্ছে। তাই সামগ্রিক বাংলা নাটক সম্পর্কে বলতে পারলেন, "খুব সুগঠিত নাটক কিংবা স্থায়ীগুণের বিষয়বস্তু সম্পন্ন নাটক নাই বা লেখা হলো –কাঁচালেখাও যদি দেশকালের এই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটায়, তাকেই অভিনন্দন জানাতে হবে। ঘর যখন পুড়ছে, তখন গঙ্গাজলের খোঁজ কে করে? – নর্দমার জলও তখন মহামূল্যবান।" নাটক সম্পর্কে এমন উদারতা আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর কার মধ্যে মেলে ?

প্রমথ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অহীন্দ্র চৌধুরী থেকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ- সকলেরই সুচিন্তিত অভিমত হলো বাংলায় যথার্থ একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা হলেন মন্মথ রায়। সংস্কৃত সাহিত্যে মহানাট্যকার ভাস একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক আর বাংলা নাটকে সেই সম্মানের যোগ্য অধিকারী হলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। সত্যকারের একাঙ্ক নাটকের সার্থক রূপকার অথবা প্রবর্তক একমাত্রই নাট্যকার মন্মথ রায়। তবে স্হান কালের ঐক্য ছাড়াও অন্যভাবে নাটকের ইউনিটি রক্ষা করা যায় না কি ? বিষয়ে, বক্তব্যে অথবা উপস্হাপনায় ? আবয়বিক বিধিনিষেধের মাপকাঠিতেই কি একটি লেখণীর মান নির্ণীত হবে অথবা বিষয়ের অঙ্গীভূত অভিপ্রায়ই মুখ্য হয়ে উঠবে – বিশেষ করে যখন আধুনিক কালে থিয়েটারের সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে। বদলেছে চেহারাও। বদলে যাচ্ছে দৃশ্যভাগ, অঙ্কভাগ- বহুক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়ছে মঞ্চ সজ্জা অথবা নির্দেশনা। মাইকেল বা অমৃতলালের প্রহসনেও যেমন স্হান কালের ঐক্য নীতি মানা হয় নি তেমনি রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকগুলিকেও তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে তা নিতান্তই 'কার্টেন রেইজার'। সবকিছু মিলেই যেন তারা অখন্ড কালসীমায় বিনিসুতোয় গাঁথা মালার মতোই একত্রে বিরাজ করছে। তাই তাঁর হাতে নবাদর্শে গড়ে উঠলো একাঙ্ক। নবনাট্য আন্দোলনও একটা সময় একাঙ্ক আন্দোলনের রূপ নিলো। তাঁর লেখা 'টোটোপাড়া', 'ফকিরের পাথর', 'অজগরমণি', 'কাজলরেখা', 'ইলা', 'মরা হাতি লাখ টাকা', 'সেমিরেমিস' প্রভৃতি একাঙ্কে সমকালীন জীবনের ছোট ছোট সমস্যা, অসঙ্গতি, বৈষম্য ধরা পড়েছে, দেখা গেছে ছোটর মধ্যে বড়কে খোঁজার নিরন্তর অনুসন্ধান। মাৎস্যন্যায়ের যুগে জনগণের নির্বাচিত প্রথম শাসক গোপাল দেব কিভাবে প্রজা শোষণ বন্ধ করলেন সুশাসনের উদ্যোগ নিয়ে তারই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে রচিত নাটক 'অমৃত অতীত'। গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে তাঁর আর এক সাড়া জাগানো নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। 'স্বর্ণকীট' নাটকে দেশদ্রোহীর একমাত্র পরিচয় দেশদ্রোহী হিসাবেই। এ নাটকে স্বামী অরিন্দমের দেশদ্রোহীতা তার পুত্র কণ্যাদের জীবনে যে কতখানি অপমান এনেছে সে ভাবনায় স্ত্রী দুর্গা মর্মাহত। দুর্গার দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব এ নাটকে এক আধুনিক নারীকে চিহ্নিত করে। তার কাছে তার স্বামীর আত্মহত্যাও যেমন তার কলঙ্ক মুছে দিতে পারে না, তেমনি তা স্ত্রী হিসাবে তাকে তার স্বামীর প্রতি উদাসীনও থাকতে দেয় না। 'বিদ্যুৎপর্ণা' একাঙ্কিকায় বিদ্যুৎপর্ণার কুহকী দেহভঙ্গিমায় পুরোহিতের মৃত্যু ঘটে। এ নাটক সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি লেখকের অঙ্গুলী নির্দেশ। 'জওয়ান' একাঙ্কিকায় দেখি দেশপ্রেমের স্পর্শে ছন্নছাড়া মানুষও বীর সৈনিক হিসাবে দেশের সেবা করেছে। তাঁর লেখা 'উইল' একাঙ্কে দেখি এক খনি মালিক মৃত্যুকালে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যান কুলিদের। কিন্তু মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের ইচ্ছাপূরণের গল্প নয় এটি, আছে আরও গভীর রহস্য। কুলিবস্তীর এক নারীর গর্ভজাত শিশুটি হলো মালিকের মেয়ে। তাঁর 'টোটোপাড়া' নাটকটির মধ্যে উৎপল দত্ত অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষরকে লক্ষ্য করেছিলেন। নাটকটি এক দ্রুত বিলীয়মান উপজাতির জীবনেতিহাস নিয়ে লেখা। 'ফকিরের পাথর' একাঙ্কটি অলৌকিক ভাবে অন্ধ সদাশিবের দৃষ্টি ফিরে পাবার কাহিনী। এ নাটকে সদাশিব ও গঙ্গার জীবন রহস্য, তাদের অন্তর্বেদনার পাশাপাশি কার্তিক, গনেশ, কলাবতীর মধুর জীবনচিত্র সীমিত পরিসরের মধ্যেও বিস্ময়কর নৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে। রূপকে, বাস্তবে, সাংকেতিকতায় নাটকটি শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক গুলির মধ্যে অন্যতম। একটা সময় এমন ছিল যখন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশের যুগে অথবা বাদল সরকার, মনোজমিত্র কিংবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যসংস্কৃতির কালেও মহীয়ান মহীরুহের মতো ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বহুরূপী, নান্দীকার, গন্ধর্ব, সুন্দরম, অভ্যুদয়, শৌভনিক- এর মতো নাট্যগোষ্ঠী যে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় করে তার প্রাজ্ঞ পুরোধা যে নাট্যকার মন্মথ রায় ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। থিয়েটারের আঙ্গিনায় শহর থেকে গ্রাম, প্রতিষ্ঠিত থেকে সদ্যোজাত সকলেই আজ যে একাঙ্কের প্রযোজনা অথবা পরিচালনায় মেতে উঠেছে তা তাঁরই যোগ্য উত্তরাধিকারকে স্মরণ করায়।

মন্মথ রায় পশ্চিমবঙ্গ যাত্রাদলের প্রথম সমন্বয় সংগঠন 'যাত্রাশিল্পী সংঘ'-এর মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন। পালাকার না হয়েও তিনি 'সত্যস্বর অপেরা' এবং 'নাট্যভারতী' দলের জন্য যথাক্রমে 'দিগ্বিজয়ী' ও 'বৌ ঠাকুরানীর হাট'-এর পালারূপ দিয়েছিলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলার আর এক ঐতিহ্য লোকনাট্য, যাত্রাপালার সাথে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন তিনি। বিশিষ্ট যাত্রা বিশেষজ্ঞ প্রভাতকুমার দাসের মতে, "বাংলার আবহমান কালের নাট্যানুশীলনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তিনি গভীরভাবে নিজেকে পরিচিত রেখেছিলেন। বিশেষত আদিযুগের নাট্যকলার ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনের বিষয়েও তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন।" বাংলা যাত্রাগানের ঐতিহ্য ও তার সর্বাত্মক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনে নাট্যশাখার সভাপতির অভিভাষণে তিনি যা বলেন তার সারমর্ম হলো এই যে,

মুসলমান শাসনকালে সংস্কৃত নাট্যকলা ও অভিনয় প্রথা রাজানুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের শাশ্বত রসপিপাসা তাতে বঞ্চিত থাকলো না। রাজউপেক্ষিত নাট্যকলা কালে প্রজা বন্দিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো বাংলাদেশের মুক্ত অঙ্গনে যাত্রাগান রূপে। শিবের ছড়া, মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, চন্ডীযাত্রা, মঙ্গলচন্ডীর গান, কৃষ্ণকীর্তন, ঢপ কীর্তন, গম্ভীরা বা গাজন গান ইত্যাদি লোকনাট্যের সংস্পর্শে প্রভাবিত যাত্রাগান নাট্যরূপে পরিবর্তিত হলো এবং ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যোৎসবে পরিগণিত হলো। এই হলো বাংলার যাত্রাপালার ঐতিহ্য বা পরম্পরা যা আজ শুধুমাত্রই গণচেতনার ইঙ্গিতবাহী, শোষকের শাসনের বেড়ি আর তার পায়ে পরানো নেই। লোকনাট্যকলা কৃষ্ণলীলা থেকে যাত্রা কিভাবে তরলীকৃত হয়ে রূপান্তরিত হলো সস্তা জনরুচির বিদ্যাসুন্দরে আর তারপর কুরুচির প্রভাব থেকে তাকে উদ্ধার করলেন মতিলাল রায় তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। মতিলাল –এর সময়টিকে যাত্রার সূবর্ণযুগ বলে অভিহিত করলেন তিনি। স্বদেশীযাত্রার বিষয়বস্তু আলোচনায় চারণ কবি মুকুন্দ দাস, ক্রমে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার বিস্তারের প্রসঙ্গ এবং সর্বশেষে চতুর্থ অধ্যায়ে আধুনিক যাত্রাপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার ব্রজেন্দ্রনাথ দের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। তবুও থেকে যায় কিছু আক্ষেপ। সত্তরের দশকে যাত্রার জনপ্রিয়তার অধঃপতনমুখীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়: "সে যাত্রা আর নেই।.....যাত্রাগান আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে দৃশ্যপটহীন থিয়েটার।.....এতে আমাদের নিজস্ব জাতীয় নাট্যটি হারাতে বসেছি।" এই দৃশ্যপটহীন থিয়েটার শত শত বৎসর ধরে ভারতবর্ষে চালু ছিল। তাঁর মতে আমাদের দেশের দৃশ্যপটহীন যাত্রাগানের আসরের মতোই আমেরিকার 'থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড' , 'এরিনা থিয়েটার' প্রভৃতি মুক্তাঙ্গন চালু রয়েছে। তিনি দেখেছেন থিয়েটারের মধ্যে যাত্রাগান ক্রমশঃ ডুবছে। মূল্যবোধের হানি ঘটছে, ঘটে তো সর্বত্রই। তবু বলেন: "অপেরায় রূপান্তরিত হলে যাত্রাগান বেঁচে যাবে" কারণ, তাঁর মতে পাশ্চাত্য দেশে অতি আধুনিক কালেও গীতিনাট্য বা অপেরার জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। আমাদের দেশে অপেরার তেমন প্রচলন না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা প্রভৃতি অপেরাধর্মী নৃত্যনাট্যের অসামান্য জনপ্রিয়তা ভোলার নয়। অপেরায় নাচ এবং গানের মধ্যে দিয়ে নাটক পরিবেশিত হয়। সবশেষে তিনি বলতে চান থিয়েটার এবং যাত্রা উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উভয়ের মধ্যে দিয়েই নাট্যশিল্প তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব সমেত বেঁচে থাকবে। তাই উভয়েই নাট্যশিল্পের পূর্ণ সার্থকতা।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে মন্মথ রায় রায় তাঁর লেখা পৌরানিক অথবা ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনীগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো শুধুমাত্র ভাবাবেগেই আচ্ছন্ন নয়। দেশপ্রেম সেখানে আছে, কিন্তু সে দেশপ্রেম পুরাণের আবরণে ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের সমকালীন অস্থিরতার চিত্র। সেদিক দিয়ে বলা যায়, পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে মন্মথ রায় আধুনিক শৈলীর জনক। তাঁর অনন্য নাট্যবৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে অন্যতম কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হলো নাটকে পুরনো উপাদান গুলিকে তিনি আধুনিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ নাট্য ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছেন। নাটকের সময়সীমাকে কমিয়ে এনেছেন। ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাবহীন চরণের পরিবর্তে সরল, সাদামাটা তথা কাব্যিক এবং নাটকীয়তাপূর্ণ গদ্যের ব্যবহার করেছেন। চরিত্রগুলির শক্তিশালী রূপায়ণ এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। নাট্যমুহূর্তগুলির চমকপ্রদ এবং উত্তেজনাময় অংশে গতিশীলতা ও আবেগঘন টানাপোড়েন –এ অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ও অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। চূড়ান্ত মুহূর্ত সহ সর্বত্রই অতিবাস্তবতার বদলে বাস্তবতার উৎপাদনে অধিকতর প্রয়াসী হয়েছেন। নিবিড় নাট্যরচনাশৈলী দ্বারা বিষয়ের মূল পর্যন্ত দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত, দ্বিধাহীন, মর্মস্পর্শী সংলাপ সহ যুগ ও নাট্য অভিপ্রায়ের সার্থক ও আধুনিক প্রতিফলন দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর লেখা 'কারাগার' এক তীব্র নাট্যবেগ সম্পন্ন নাটক। পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতিগত আকস্মিক বৈপরীত্য, সংলাপের আবেগকম্প্র ধাবমান গতি ও ঘনীভূত নাট্যোৎকাণ্ঠা নাটকের মধ্যে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছে। নাটকের দুই বিরোধী শক্তির একদিকে যেমন আছে কংস, বিদূরথ, নরক প্রভৃতি চরিত্র, অন্যদিকে তেমনি আছে বসুদেব, কঙ্কণ, কঙ্কা প্রভৃতি চরিত্র। একদিকে কংসের নিষ্ঠুর অত্যাচার আর অন্যদিকে বসুদেবের আপসহীন সংকল্প আর প্রতিবাদের ফলে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়েছে তা-ই এই নাটকের প্রাণ। কংস চরিত্রের অভ্যন্তরে দানব ও মানব সত্তার সুতীব্র দ্বন্দ্ব, বিদূরথের প্রভূভক্তি ও পুত্র বাৎসল্যের করুণ বিরোধ নাটকে এক নিরুচ্ছার বেগ ও আবেগের উত্তাপ সঞ্চার করেছে। তাঁর 'মহাভারতী' (১৯৫২) নাটকটিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পূর্বাপর ধারাবাহিক

নাট্যদলিল বলা যায়। ভাবাবেদনে তা যেন 'কারাগার'-কেও ছাড়িয়ে গেছে। 'কারাগার' নাটকে রাজোচিত আড়ম্বব যেখানে বহিরাবরণ অথবা বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে সেখানে 'মহাভারতী'-র পটভূমি হিসাবে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তবর্তী রামনগর গ্রাম ও তার গ্রামীণ চাষী পরিবারের জীবন চিত্রণ অনেক মানবিক। তা যেন স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবন্ত লড়াইকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করায়। তাঁর 'সীতা' নাটকে রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন ও শাস্ত্রসংস্কারের দ্বারা নিজের হৃদয়বত্তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি তাঁর নিরভিযোগ , মৌন অন্তঃসত্তার সংগ্রাম গূঢ় নাটকীয় রসে পাঠকের মনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। রামচন্দ্রের অবরুদ্ধ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ উন্মোচিত হয়েছে বশিষ্ঠের নিকটে। লোকাচার এবং শাস্ত্রসংস্কারের বিরুদ্ধে এক আধুনিক মানুষের বিদ্রোহ যেন এখানেও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তৎসহ শম্বুকের তেজোদীপ্ত অকাট্য যুক্তির অন্তরালেও লুকিয়ে আছে আধুনিক ভাবনা। তাঁর 'চাঁদ সদাগর' (১৯৩৪) নাটকে আচার সিদ্ধ দেবতা অনুপস্থিত। তা মঙ্গলকাব্যের ভাবনা অনুসারী তো নয়ই বরং মনে হয় যেন সেখানে দেবদেবীর পোষাক পরে সাধারণ নর-নারীরাই চলাফেরা করছেন। চাঁদ সদাগর চরিত্রটি নিজে এখানে সংগ্রামী মানুষের প্রতীক। প্রস্তরকঠিন প্রতিজ্ঞা ও দুর্জয় চারিত্র্যশক্তি নিয়ে চরিত্রটি নাটকে উপস্থিত। চরিত্রটি মানবিকও বটে। বিংশ শতাব্দীর পরাধীন বাঙালি জাতির বেদনা ও গ্লানিকে যেন সে বহন করে চলেছে। কিন্তু যে তেজ ও বীর্যবত্তাকে সেখানে তিনি প্রোথিত করেছেন তাতে নাটকটি প্রাচীণ পুরাণের কাহিনী না হয়ে বাংলা ও বাঙালির আধুনিক পুরাণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা'-র মধ্যেও যেন তারই উত্তরাধিকারকে লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিংশ শতাব্দীর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সাবিত্রী চরিত্র মহাভারতের বনপর্বের প্রদত্ত চরিত্রের অনুসরণ মাত্র হলেও মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' বস্তুতই আধুনিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপিয়াসী এক আধুনিক নারী। তাঁর লেখা 'মীরকাশিম' নামক ঐতিহাসিক নাটকে মীরকাশিমের সংলাপ খাঁটি ঐতিহাসিক রসসমৃদ্ধ। জাতপাত, অশিক্ষা আর ধর্মান্ততার বিরুদ্ধে লালনের বাণী ও সাধনা নিয়ে লেখা লেখা 'লালন ফকির' নাটকটি। এক অঙ্কে দশটি দৃশ্যে লেখা এ নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আঞ্চলিক উপভাষায় সংলাপ রচনার দক্ষতা। পূর্ববাংলার কুষ্টিয়ায় এই উপভাষার জন্য নাটকটির রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল তা খণ্ডনের জন্য পরবর্তীতে এ নাটকের সংলাপকে মান্য চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে নেবার স্বাধীনতা নাট্যকার দেন কোনো কোনো প্রযোজককে। কিন্তু ভাষাগত তাত্ত্বিক বিচারে 'লালন ফকির'-এর মূল সংলাপ আজও উত্তরাখন্ডের ভাষাবিদদের কাছে তার আঞ্চলিকতার মূল্যমান সমেত গবেষণার আধার হয়ে আছে। তৎসহ এ নাটকের আর একটি বিষয় যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো : তিনি তাঁর এ নাটকে দেখিয়েছেন লালন জন্মেছিলেন এক কায়স্হ হিন্দু পরিবারে, তাঁর উপাধি ছিল কর। এ তথ্যটি নিয়ে পরবর্তীতে বিতর্ক উঠলেও মুনসুরউদ্দীন মুহম্মদ মহাশয়ের রচিত সাতখন্ডের 'হারামনি' গ্রন্হে তাঁর মতের সত্যতার প্রমান মেলে। মুনসুরউদ্দীন মুহম্মদের মতে: "লালন ফকির অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কুমারখালি সংলগ্ন গড়াই নদীর তীরে ভাড়ারা (চাপড়া-ভাঁড়ারা) গ্রামে জন্মান। তাঁর জন্ম কায়স্হ পরিবারে, পদবী কর (মতান্তরে রায়)। বাবা-মার নাম মাধব ও পদ্মাবতী।" মন্মথ রায়ের দূরদর্শীতা অথবা তথ্যনির্ভরতার প্রামাণ্যতা বিষয়ে অতঃপর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। সত্তরের দশকের বাংলার সমসাময়িক ও আধুনিক বিষয়গুলিও অনেকক্ষেত্রেই মন্মথ রায়ের নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনি লেখেন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি নাটক। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর লেখা নাটক 'আমি মুজিব নই' আর মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা আরো একটি নাটক হলো 'স্বাধীনতার ইতিহাস'। এই তিনটি নাটক যেন মাতৃভূমি তথা ধাত্রীমাতার কাছে তাঁর একনিষ্ঠ অঙ্গীকার ও কৃতজ্ঞতা। তাঁর লেখা 'বণ্যা' বণ্যা বিধ্বস্ত এক গ্রাম্য ভূখন্ডের সামাজিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কাহিনী যা কিঞ্চিৎ চলচ্চিত্রধর্মীও বটে। এ নাটকে জজসাহেবের মনোবিকলন ও মৃত্যু এবং রাঙা চেলি পরা বিয়ের কণের সাথে তার বরের আকস্মিক সাক্ষাৎ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীতেও। বলা যায়, মন্মথ রায়ের নাটকের একদিক যেমন মঞ্চে অভিনয়ের জন্য অন্যদিকে তেমনি তা সাহিত্য পাঠের উপযোগীও বটে। বিষয় এবং আঙ্গিকের বহুবিধ বৈচিত্র্যে তাঁর নাটকগুলি সত্যই অনন্য। তৎসহ বলা যায়, মন্মথ রায়ের ভাবনায় ঘটেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যভাবনার মিলন যা প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন বঙ্গীয় নাট্যশালায় এবং যার প্রভাব পড়েছে পরবর্তীতেও।

প্রখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ বলেন: "মন্মথ বাবুর ভাষা অলংকৃত এবং কবিত্ব সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব ইহার নাটকে পড়িয়াছে একথা বলিলে অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ইহার ভাষাতেও প্রকৃতির অবগুন্ঠন অপসৃত হইয়াছে ও তাহার নয়নাভিরাম রূপ ও সৌন্দর্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" বস্তুতঃই নাটকের সংলাপ ও ভাষার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। তথাকথিত গৈরিশ ছন্দের গতানুগতিক প্রভাবকে নাটকের ভাষায় পরিহার করলেন তিনি। সংলাপকে করে তুললেন আধুনিক, মৌখিক, লৌকিক এবং তৎসহ আলংকারিক। তাঁর লেখা 'কারাগার' নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো এর সংলাপ। এ সংলাপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো তীব্র গতি সম্পন্ন ও বেগবান। ছোট ছোট বাক্যাংশগুলি বর্শাফলকের মতো যেন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসায়। আবেগের ক্ষত মুখে যেন রক্তের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। একই শব্দের পুনরুক্তি, অর্ধ সমাপ্ত কিংবা অসমাপ্ত বাক্য প্রয়োগ, পরস্পরবিরোধী শব্দ ও বাক্যের পাশাপাশি সন্নিবেশ, উত্তেজনার চূড়ান্ত মুহূর্তে উঠে আবার মুহূর্তের মধ্যে দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদির ফলেই যেন সংলাপ এত বেশী গতিশীল ও উত্তেজনাময় হয়ে উঠেছে। সব থেকে তা কার্যকরী হয়ে উঠেছে পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে। যেমন 'কারাগার', 'দেবাসুর', 'চাঁদ সদাগর' কিংবা 'মীরকাশিম'। কোনো কোনো জায়গায় সংলাপ কাব্য সুষমাময় ও ছন্দিতও বটে। যেমনঃ –কংসের সংলাপ: "মিথ্যা মিথ্যা –অথবা তোমরা ভুল দেখেছ, ভুল বুঝেছ। আমি দুর্বল ? মিথ্যা কথা। মুহূর্তের তরেও আমি এতটুকু দুর্বল নই। আমি নির্মম, আমি দুর্নিবার শয়তান।.....একি ! চারিদিকে হাহাকার.....চারিদিকে দীর্ঘশ্বাস, আকাশে বাতাসে কি হৃদয়ভেদী ক্রন্দনরোল। .....আমি অত্যাচারে অত্যাচারে কৃষ্ণকে জর্জরিত করে তাঁর স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যে তাঁকে টেনে এনেছি।" (কারাগার) এ সংলাপ শুধুমাত্র পৌরাণিক নয়, তা আধুনিক। এ সংলাপে অবচেতন মনের দ্বৈত সত্তা, মানবিক ও পাশবিক দ্বন্দ্বের এক অসাধারণ ও যুগপৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অথবা দেবকীর সংলাপ: "তুমি পারবে না – কারাগারে আজ দেশের যত ধর্মাত্মা, যত পূণ্যাত্মা, যত মহাত্মা-কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন- কারাগার আজ পূণ্য তীর্থ ! কারাগার আজ স্বর্গ।" এ সংলাপ ধ্রুপদী পৌরাণিক ভাবাবেগ সম্পন্ন হলেও তার কথনরীতিতে আধুনিকতা মিশে আছে। আবার একইসঙ্গে খুঁজে পাই অন্যরীতির সংলাপকেও। যেমনঃ- চন্দনা।..... কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে আকাশ হলো মাতাল, বাতাস হলো পাগল ? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে.....চরণ-পদ্মের পরশ নিল.....ধন্য হয়ে ফণা ধরল.....ফণা ধরে তার জয়যাত্রার জয়ছত্র হল ? আমি দেখে এলাম.....আমি দেখে এলাম..... রূপ নয় রূপের আগুন কোটি কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে- আমিও...আমিও....." (কারাগার)। এ সংলাপ যেন গদ্যের নয়, কোনো এক আধুনিক কবিতার যার চরিত্র ও পটভূমি প্রাচীন পুরাণ অথচ যা দূরাচারী ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যঞ্জকতায় পরিব্যপ্ত। তাঁর লেখা প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক 'দেবাসুর' (১৯২৮)- এর সংলাপ এরূপঃ "আমি ডুব দিলাম শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয় একযুগ পরে সেই দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃংখলপাশ ছিন্ন করবে- সেই আশাতে আমি ডুব দিলাম। আমার জাতি অক্ষয় হোক-আমার জাতি অমর হোক- আমার জাতি জয়লাভ করুক।" এ সংলাপে শুধু দেশাত্মবোধ নেই, যুগান্তরের আবেদন রয়েছে যা নাটকের সীমিত সময় অথবা দেশ-কালের গন্ডীকে ছাড়িয়ে যায়। চাঁদ সদাগর নাটকে শোকার্ত বেহুলার সংলাপ: "জলে ভাসিয়ে দিলে বেঁচে উঠবে ? ...না বাবা, ভাসিয়ে দিয়ো না...ঐ দেখ, সোনার দেহ...দিয়ো না...দিয়ো না.....।" এ যেন যেন শুধু বেহুলার সংলাপ নয়, স্বামীহারা কোনো এক আধুনিক অসহায় নারীর করুণ কাতর অভিব্যক্তি। যে সংলাপ সকল কালে সত্য তেমনই এক সংলাপ হলো: "চাইতে যদি কিছু হয়, চাইব শান্তি, মনের শান্তি। গঙ্গা চল, আমায় ঘরে নিয়ে চল। আঃ বাঁচলাম ! অন্ধকার, অন্ধকার তো নয়- আমার সামনে শান্তির পারাবার।" ('ফকিরের পাথর' [১৯৫৯], চৈত্র সংক্রান্তি গাজনের দিনে অন্ধ চাষী সদাশিবের প্রার্থনা)। ড. অজিত কুমার ঘোষের ভাষায় –"তাঁর সংলাপ আবেগে থরো থরো কাঁপে। নাট্যকারের যৌবনের উষ্ণ রক্তধারা নাটকে সঞ্চারিত, সেখানে সুরাসুরের মন্থন চলছে। সেই মন্থনে উঠে এসেছে অমৃত ও বিষ।" মন্তব্যটি যথার্থই সার্থক।

স্বাধীনচেতা গণতান্ত্রিক ভাবনার মানুষ বলে একসময় সকলের কাছেই মন্মথ রায় শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন। তবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেছেন বারেবারেই। ১৯৭২ এ লেখা 'সাধারণ রঙ্গালয় ও আমি' নিবন্ধের অন্তিম অনুচ্ছেদটিতে গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন: "স্বাধীনতার গ্লানি অতীতকে নমস্কার করছি। স্বাধীনতা উগ্রমথিত বর্তমানকে বরণ করছি। সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে অগ্রিম প্রণাম জানাচ্ছি।" পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি। ১৯৭২ সালে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

সমিতির কার্যকরী সভাপতিও ছিলেন তিনি। ১৯৬২-তে যখন সরকার নতুন করে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল আনে তখন বাংলার নাট্যশিল্পীরা প্রবল প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলন পরিচালনা কমিটির সভাপতিও ছিলেন মন্মথ রায়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট প্রদান করা হয়েছিল। দীনবন্ধু পুরস্কারও প্রথম প্রদান করা হয়েছিল তাঁকেই। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পথিকৃৎ তাঁকে বলা যায় কিনা জানিনা তবে তাঁর নাটকের ভাবাবেদনে যে প্রত্যয় ও বিশ্বাস জড়িয়ে আছে তা যে গণনাট্য ভাবনারই পরিবাহী একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপা থিয়েটারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি।নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন, নাট্য সাহিত্য আলোচনা ও সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচীও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন তিনি। বিচিত্রা, আত্মশক্তি, শণিবারের চিঠি, যুগান্তর, জনসেবক, সবুজপত্র, ভারতবর্ষ সহ প্রায় ৭৫টি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত নাটক রচয়িতা ছিলেন তিনি। তাঁর ৮৯ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে রয়েছে নানা সৃষ্টির সম্ভার। পৌরাণিকতা অথবা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'আমি মুজিব নই' অথবা 'শরৎ বিপ্লব' অথবা একাঙ্কের কান্ডারী মন্মথ রায়ের বিশাল বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির সম্ভারে ধ্রুপদী থেকে চির গণ আন্দোলনের পথই যেন নির্মিত হয়েছে। ভারতে প্রথম সবাক ইংরেজী ফিল্ম 'কোর্ট ডান্সার', ক্ষুধিত পাষাণের চিত্র কাহিনী, শ্রীশ্রী সারদামণি পালারের্কড আর নজরুল ইসলাম সহ প্রায় অর্ধশত দলিল চিত্র তাঁরই অসামান্য সৃষ্টি। সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর সব রকম নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুগ কাল ব্যাপী অবিরম নিরলস বিদ্রোহই যেন ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

বন্ধুবর কাজি নজরুল ইসলাম একবার মন্মথ রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরেনা, তেমনি আনন্দ দু'চোখ ভরে পান করেছি আপনার লেখায়।"(৪ঠা জুলাই, ১৯২৭) নজরুলের এ উক্তিতে শুধু নাট্যকার নয় বরং সাহিত্যিক মন্মথ রায়ের এক সার্থক সৌন্দর্য্য সৃজনের সুকৃতি লুকিয়ে আছে। বলাবাহুল্য, তাঁর নাটকের অধিকাংশ গানগুলিও নজরুলের লেখা। বাংলা নাটককে তার ধূসর গতানুগতিকতা, পুনরুত্থানবাদী পৌরাণিকতা আর ঐতিহাসিক রোমান্সের পৌণপুনিকতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি। পৌঁছে দিয়েছিলেন আধুনিক কালের দোরগোড়ায়। একসময় আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলা যেতে পারে।"(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫/৫/১৯৫৭) আর দেশ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "তিনি কখনো থেমে থাকেন নি, সব সময়েই এগিয়ে চলেছেন – তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে গতি আছে, বিবর্তন আছে, নানান সুরের অর্কেষ্ট্রা বাজাতে তিনি সিদ্ধহস্ত।" এই বিবর্তনের ধারা এবং ঐতিহ্যেই যে তাঁর নাট্যকৃতির প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা বাংলা সাহিত্যে আজও অম্লান সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।পরিশেষে প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষের একটি অসাধারণ উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করব। সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ অনুষ্ঠানে টেলি ফটো লেন্সের ক্লোজ আপে তাঁর ছবি নেবার সময় পরিচালকের অনুভূতিঃ "তাঁর বক্তৃতা এখনও আমার চোখে ভাসে, কানে বাজে।..... ওঁর সজল চোখ যেন একশো বছরের ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও ধারাবাহিকতার ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করছে।" সেলুলয়েডের কৃত্রিম চোখ এখানে অতি সযতনে যে ঐতিহ্যের সজল চিরায়ত চোখ কে প্রত্যক্ষ করেছে তাই আসলে আমাদের বাংলা নাটকের শাশ্বত পরম্পরা।

<u>সহায়ক গ্রন্থঃ</u>

মন্মথ রায়ঃ জীবন ও সৃজন-ড. জয়তী ঘোষ
নাট্য ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি-অপূর্ব দে
রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস- ড. জগন্নাথ ঘোষ
বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস-ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গণনাট্য এবং নবনাট্য একটি বিতর্ক- ড.মন্দিরা রায়
কারাগার ও রাজপুরী-মন্মথ রায়
নির্বাচিত নাট্য সংকলন-মন্মথ রায়
একাঙ্কিকা-মন্মথ রায়

নাট্যকার মন্মথ রায়ঃ স্মরণ ও মনন-ড. সনাতন গোস্বামী

বাংলা একাঙ্ক নাটকঃ রূপ ও রূপকার-ড. সনাতন গোস্বামী

বাংলা একাঙ্ক নাটক- ড. সরোজমোহন মিত্র

মন্মথ রায়ের কারাগার-ড. স্মরণ আচার্য

নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার- ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

নাটকের কথা-ড. অজিত কুমার ঘোষ

চাঁদ বণিকের পালাঃ প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা- অনিরুদ্ধ আলী আখতার